প্রয়োজন শিশুকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা

শরীফুল্লাহ মুক্তি

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিগত কয়েক বছরে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে এদেশে বেশকিছু ভালো কাজ হয়েছে। যার ফলাফল হিসেবে গত কয়েক বছরে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির হার বেড়েছে আশাতীত। ঝরে পড়ার হার বেশ কমেছে। বর্তমানে ছেলেমেয়েদের ভর্তির হার প্রায় সমান অবস্থানে চলে এসেছে। শিক্ষা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে। কিন্তু পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার মান নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কোথায় যেন একটা ঘাটতি আছে; প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা এখনও কাঙ্ক্ষিক্ষত মানে পৌঁছাতে পারছি না। সবাই বলছেন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কথা। আর বর্তমানে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাই গুরুত্বের সঙ্গে কাজও করে যাচ্ছেন।

একটি দেশের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা যেসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যালয়ের ভূমিকা। বিদ্যালয়ের ভূমিকা

যথাযথ না হলে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অধরা থেকে যাবে। বিদ্যালয়ের অনেকগুলো কার্যক্রমের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রম। শ্রেণীকক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রম যদি কার্যকর ও ফলপ্রসূ না হয় তা হলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর যে সব দেশ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে বা সফলতা অর্জন করতে পেরেছে সে সব দেশ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রমকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে যে সব দেশ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করছে তারা শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিশুকেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশলসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি কার্যকরভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে শিক্ষকগণ বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করানোর লক্ষ্যে লাগসই পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ একজন শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সহজ, আকর্ষণীয়, সাবলীল, প্রাণবন্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। বিভিন্ন শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বের আলোকে শিশুর শিখন-প্রক্রিয়ায় শিখন-শেখানো বিভিন্ন পদ্ধতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। শিশুর কার্যকর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় এ সব

পদ্ধাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এ সব পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা এবং কোন শিখন পরিবেশে কোন শিখন পদ্ধতি অধিক উপযোগী তার একটি সঠিক নির্দেশনা জানা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যাবশ্যক।

আমাদের দেশেও এক যুগেরও বেশি সময় ধরে শিশুকেন্দ্রিক বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সফলতার মাত্রা কাঙ্ক্ষিক্ষত পর্যায়ে নয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অনেক ধরনের সমস্যা উঠে এসেছে শিক্ষক, পরিদর্শক, শিক্ষাবিদ, সমালোচক সবার কথা থেকে। তন্মধ্যে শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকা, শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত আদর্শ না থাকা, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া, শ্রেণীর আসন-ব্যবস্থা অনুকূল না হওয়া, ক্লাসের ব্যাপ্তি কম হওয়া, শ্রেণীকক্ষের আকার-আকৃতিগত সমস্যা, শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-যন্ত্রপাতি-উপকরণের ঘাটতি, শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা, প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন পদ্ধতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, শিক্ষকের বিষয়জ্ঞানের অভাব, শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, শিক্ষকের আন্তরিকতার ঘাটতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সমস্যাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। শুধু শিক্ষকের বিষয়জ্ঞানের অভাব, শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, শিক্ষকের আন্তরিকতার ঘাটতি এ সমস্যাগুলো একাডেমিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। এগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ,

অনুশীলন ও ইতিবাচক মনোভাব। শিক্ষকের শক্তিশালী একাডেমিক দক্ষতা ছাড়া শিশুকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, দক্ষতা অর্জন ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খুবই জরুরি।

যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক মনোভাব থাকে তাহলে বিভিন্ন সমস্যা (যেমনÑ শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকা, শ্রেণীর আসন-ব্যবস্থা অনুকূল না হওয়া, ক্লাসের ব্যাপ্তি কম হওয়া, শ্রেণীকক্ষের আকার-আকৃতিগত সমস্যা, শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-যন্ত্রপাতি-উপকরণের ঘাটতি ইত্যাদি) সংবলিত শ্রেণীতেও শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব। এ জন্য প্রথমেই শিক্ষকদের জানা উচিত আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শিশুকেন্দ্রিক/শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কোন কোন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ উপযোগী। প্রয়োগ-উপযোগী এসব পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে শিক্ষককে কিছু সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এসব দক্ষতার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছেÑ শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা, শিক্ষকের প্রস্তুতি ও যথাযথ পরিকল্পনা করার দক্ষতা, শিক্ষকের যোগাযোগ দক্ষতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতা, মনোবৈজ্ঞানিক বা আচরণ সম্পর্কিত দক্ষতা, একীভূতকরণ দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের পাঠে

সাক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের দক্ষতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি, ব্যবহার ও ব্যবহারের পর যথাযথভাবে সংরক্ষণ দক্ষতা, শিখন-শেখানো কার্যক্রম মনিটরিং করার দক্ষতা, প্রশ্নকরণের দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে মূল্যায়নের দক্ষতা ইত্যাদি।

শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার ক্ষেত্র অনেক বড়। শ্রেণীকক্ষে শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের পেশাদারিত্বকে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এ উপক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। অর্থাৎ একজন শিক্ষকের শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে ইতিবাচক। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে শিশুকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম সফল ও সার্থক হবে না। সময়ানুবর্তিতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে শৃঙ্খলাবোধের প্রতি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে হলে শিক্ষককেও আত্ম-শৃঙ্খলার চর্চা করতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারলে যথাযথভাবে শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। শিক্ষকতা পেশার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই একজন শিক্ষক নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন তিনি কোন কোন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন এবং তা কখন করবেন, কীভাবে করবেন। শিক্ষকের

বিষয়াভাত্তক জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তারপর প্রয়োজন শিক্ষকের প্রস্তুতি ও যথাযথ পরিকল্পনা করার দক্ষতা। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে। এর আওতায় পড়ে দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী ক্লাসের প্রস্তুতি নেয়া। পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা থাকা এবং সে অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে পাঠ-পরিকল্পনা যেন গতানুগতিক না নয়, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। প্রতিটি পাঠের জন্য অবশ্যই আলাদা আলাদা পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে যোগাযোগ দক্ষতা। কেননা সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে না পারলে শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব হবে না। শিক্ষকের প্রমিত ও স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে। আই-কন্ট্যাক্ট কার্যকর যোগাযোগের সহায়ক। তাই শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আই-কন্ট্যাক্ট করার দক্ষতা থাকতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষককে পায়চারী করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে

হবে তারপর নিজে বলতে হবে বা উত্তর দিতে হবে। যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি দরকার সমস্যা সমাধান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জন। সমস্যা-সমাধান বা সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করতে পারা এবং সে অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দক্ষতা একজন শিক্ষকের থাকতে হবে।

শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন ধৈর্যশীল হওয়ার দক্ষতা অর্জন করা। বিভিন্ন শিক্ষার্থী ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ক্রম অনুসরণ করে শেখে। যদি কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের দেয়া প্যাটার্ন অনুসরণ না করে ভিন্নভাবে শেখে, সে জন্য অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল হতে পারার দক্ষতা শিক্ষকের থাকা জরুরি। প্রতিটি শিশুর প্রতি শিক্ষকের আস্থা থাকতে হবে। উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শেখালে প্রতিটি শিশু শিখতে পারবেÑ এই বিশ^াস একজন শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে। মনোবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকের আর একটি দক্ষতা হচ্ছে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেরণা ও প্রেষণা সৃষ্টির দক্ষতা অর্জন। শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেরণা ও প্রেষণা সৃষ্টি করতে না পারলে তারা পাঠ সহজে শেখে না। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা/প্রেষণা সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপন পদ্ধতি পরিবর্তন

করতে হবে, পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে বিষয়-সংশ্লিষ্ট কৌতুক উপস্থাপনের দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে। এছাড়াও একজন শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন অর্থাৎ কোন শিশু কোন বুদ্ধিমত্তার তা অনুধাবনের ক্ষমতা থাকা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

পৃথিবীর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদানের প্রবর্তিত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। আদর্শ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় যে সব শিশুকেন্দ্রিক/শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলো সাধারণত অনুসরণ করা যায় সেগুলো হলোÑ পরীক্ষামূলক/পরীক্ষণ পদ্ধতি, প্রকল্প/প্রজেক্ট পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, আবিস্ক্রিয়া পদ্ধতি, বহুমুখী শিখন-শেখানো পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, ভূমিকা-অভিনয় পদ্ধতি, ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতি, দলগত শিখন পদ্ধতি, হামদল পদ্ধতি, খেলার মাধ্যমে শিখন, পাঠচক্র, চর্চা ইত্যাদি।

যে পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে কোন একটি ঘটনার পেছনে যে সব কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে তাদের সঠিকভাবে খুঁজে বের করা যায় এবং তাদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন করা যায় তাকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলে। প্রকল্প/প্রজেক্ট পদ্ধতি হলো এমন একটি পদ্ধতি যা প্রয়োগ বা অনুসরণ

করে শিক্ষার্থীরা কোন উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলি সামাজিক পরিবেশে শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরাই সম্পাদন করে। এখানে শিক্ষার্থীরা একক কিংবা দলগতভাবে কাজটি সম্পাদন করে থাকে। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি এমন একটি পরিকল্পিত পদ্ধতি যেখানে নির্ধারিত পাঠকে কেন্দ্র করে কতগুলো ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের মূল-বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এটি একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া অর্থাৎ পাঠ-কে কেন্দ্র করে শিক্ষক যেমন তার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন, তেমনি শিক্ষার্থীরাও পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য শিক্ষকের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে পারে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও একটি শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি। শিক্ষার্থীকে তার নিকট-পরিবেশের গাছপালা, ফুল-ফল, পশুপাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, কল-কারখানা, শিশির, কুয়াশা, মাঠ-ঘাট ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতিতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজেদের মতো করে শ্রেণীতে উপস্থাপন করে। আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসু মনকে জাগ্রত করা। এ পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষক সমস্যার আকারে পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

স্বাধীন চিন্তা-শক্তি প্রয়োগ করে যুক্তি দিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় কিছু জেনে নেয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন। আধুনিককালে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূ, অংশগ্রহণমূলক ও অধিকতর কার্যকরী করার জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে একটি শক্তিশালী পদ্ধতি হলো মাথা খাটানো বা ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে আলোচনায় সবাইকে সক্রিয় করা যায়। একটি ধারণার ওপর সম্মিলিতভাবে জীবনভিত্তিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে ন্যূনতম সময়ে সর্বাধিক বক্তব্য বের করে আনার যে প্রক্রিয়া তাই ব্রেইন স্টর্মিং। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের নিকট থেকে কোন বিষয়ে খোলাখুলি মতামত চাওয়া হয় বা ব্যক্ত করতে বলা হয় এবং সব মতামত প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করে পরবর্তীকালে পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। বহুমুখী শিখন-শেখানো পদ্ধতি মানুষের বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তা এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যাবলির ধারণা ও তার ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত। এর মূল ভিত্তি হলো প্রফেসর হাওয়ার্ড গার্ডনারের বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুসারে মানুষের কমপক্ষে ৯ ধরনের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। এর মধ্যে কোনোটি প্রবল/প্রকট এবং কোনোটি প্রচ্ছন্ন/দুর্বলভাবে থাকে। শিক্ষার্থীরা তাদের সবল বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে শেখে। সুতরাং মানসম্মত/ফলপ্রসূ পাঠদানে বিভিন্ন কলাকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটানো

হয় যাতে প্রাতাট শিক্ষার্থী তার সবল বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে সহজে পাঠ শিখতে পারে।

ভূমিকা-অভিনয়ও একটি শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি। শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়। তারা পুতুল, রান্না-বান্না ও বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলতে ভালোবাসে। এ পদ্ধতিতে শিশুরা বিশেষ ঘটনা ও বিষয়ের উপর নিজেরাই ভূমিকা-অভিনয় করে। সাধারণত সমাজবিজ্ঞান ও ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে ভূমিকা-অভিনয় প্রয়োগ করা হয়। ভূমিকা-অভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা বেশ আনন্দ পায়। যে সব বিষয় আলোচনা বা বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য সেই বিষয়গুলো সহজেই চরিত্র/ভূমিকা-অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। দলগত শিখন/ছোট্ট দলে আলোচনা পদ্ধতিতে শিশুদের কয়েকটি ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে স্বতন্ত্র কাজ দিয়ে সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। দলের সবাই আলাপ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পন্ন করে। দলগত শিখনে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে। দলে কাজ করার সময় একে অপরকে সহযোগিতা করে। উচ্চ মেধার শিক্ষার্থী নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীকে দলীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্য করে এগিয়ে নিয়ে যায়। দলীয় কাজ শেষে দলনেতা দলীয় কাজ উপস্থাপন করেন। সব দলের উপস্থাপন শেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। দুজনের দলকে হামদল বলে। হামদল সবচেয়ে ক্ষুদ্র দল এবং দুজনের দলের তৎপরতাই হামদলীয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অনেক ধারণা পাওয়া যায়

এবং অংশগ্রহণকারীদের বসার স্থান পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। আলোচনা পদ্ধতি হলো এমন এক পদ্ধতি, যে পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শ্রেণীকক্ষে পাঠের বিষয়-সংশ্লিষ্ট কোন পূর্ব-নির্ধারিত বা অনির্ধারিত বিষয়ে ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে পারস্পরিক মতবিনিময় ও উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ পায়। আলোচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেসব কৌশল অনুসরণ করা হয় তা হলোÑ বিতর্ক, সাক্ষাৎকার, প্যানেল-আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি। শিখনীয় বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক ও আনন্দময় করে তোলার জন্য খেলার মাধ্যমে শেখানো একটি অভিনব কৌশল। শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক খেলার মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন করেন। আবার শিশুরা পাঠ কতটুকু আয়ত্ত করেছে তা যাচাইয়ের জন্য খেলার আয়োজন করতে পারেন। বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে খেলার কাজ সর্বাধিক প্রয়োগ হয়। সব শিশুকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে হয়। তাই এ পদ্ধতি অতিমাত্রায় শিশুকেন্দ্রিক এবং এ পদ্ধতি ব্যবহারে শিশুর শিখন অধিকতর ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়।

শিশুকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু নির্ধারিত কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমনÑ জোড়ায় কাজ, একাকী কাজ, ভূমিকা-অভিনয়, আলোচনা, দলগত কাজ, ব্যাখ্যা, প্রশ্নকরণ, পর্যবেক্ষণ, জানা থেকে অজানা প্রক্রিয়া অনুসরণ, অংশ হতে সামগ্রিকীকরণ, সমগ্র থেকে অংশীকরণ, সহজ হতে কঠিনে ধাবিতকরণ, মূর্ত থেকে বিমূর্তকরণ,

আনাদৃষ্ট থেকে নাদৃষ্টের পথে অগ্রসর, পর্যবেক্ষণ হতে যুক্তিনির্ভরকরণ, সাধারণ থেকে বিশেষীকরণ, বিশেষ থেকে সাধারণীকরণ, বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ, সংশ্লেষণ থেকে বিশ্লেষণ, ব্রেইন স্টর্মিং, শিক্ষা উপকরণের যথাযথ প্রয়োগ, শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ, শৈল্পিক উপস্থাপন, যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ ইত্যাদি।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বর্তমানে কিছু ধারণাগত পরিবর্তন এসেছে। আজ আর শিক্ষক জ্ঞানদাতা বলে স্বীকৃত নন। তিনি এখন শিশুর বন্ধু, সহায়ক এবং পথপ্রদর্শক। শিক্ষার্থী শিক্ষকের নীরব শ্রোতা নয়। শিক্ষকের সামনে সে উপস্থিত হয় তার জিজ্ঞাসু মন ও সমস্যা নিয়ে। শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিশু-শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও সৃজনীশক্তি বিকাশের জন্য শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-গবেষকগণ কর্মভিত্তিক, লেভেলভিত্তিক ও শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এতে পাঠ গ্রহণের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, ফলে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই কাজ করতে শেখে। তাদের মাঝে স্বয়ংশিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিস্বরূপ খুব সহজেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ করায় তাদের একঘেঁয়েমি দূরীভূত হয় এবং শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হয়। কার্যকর ও ফলপ্রসূ শিশুকেন্দ্রিক

পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে শিখনে অংশগ্রহণ করে। এতে শিক্ষকের কাজ/পাঠ-উপস্থাপন অনেক সহজ হয়ে যায়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক খুবই মধুর ও আন্তরিক হয়। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়। মানসম্মত শিক্ষার জন্য এটি খুবই জরুরি। মোট কথা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

[লেখক : ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), বারহাট্টা, নেত্রকোনা]
ahmsharifullah@yahoo.com